দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 02 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শহীদ ইকবাল

বিশ্ববিদ্যালয় স্বভাবমতো চলুক

একটি খবর দিয়ে শুরু করি। 'ইদানীং বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ অনভিপ্রেত অবস্থার সমাধানকল্পে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাওয়া গোয়েন্দা বিভাগের গোপনীয় প্রতিবেদনে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে দুটি সুপারিশ করা হয়েছে– এক. শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ, দুই. এরকম নিয়োগে পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা।' এখন এ পর্যায়ে বেশ ক'মাস আগের কথা মনে পড়ছে। তখন পে-স্কেল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বনাম আমলা দ্বন্দ্ব চলছিল, কার মর্যাদা কত বেশি বা কম, কে আগে বা পরে ইত্যাদি। প্রশ্ন জাগে, আমার প্রফেশনাল মর্যাদা নিয়ে আমি কেন শঙ্কিত? কিংবা পিছিয়ে পড়া বা এগিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার কারণ কী? এখন আবার একই প্রশ্ন ও শঙ্কা কাজ করছে, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চাই তাহলে আবার পরীক্ষায় বসতে হবে নাকি! বিশ্ববিদ্যালয় তো গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জায়গা। সেখানে একজন ছাত্র সাধারণত ভালো ফল করে শিক্ষক হন। জ্ঞানচর্চার পথই তিনি বেছে নেন। সেটি হতে পারে পাণ্ডিত্যের জায়গা। কিংবা মুক্ত জ্ঞানে বিবেকোচিত মানুষ সৃজনের ক্ষেত্র। কারণ এখনো বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয়ই বিবেকবোধের জায়গা। হ্যাঁ, হয়তো মান পড়ে গেছে। যথোচিত শিক্ষা বা জ্ঞানের অনুকূল পরিবেশ নেই। কিন্তু তাই বলে তার অর্জন তো অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানতাপস ড. শহীদুল্লাহ, আরসি মজুমদার, অধ্যাপক রাজ্জাক, সরদার ফজলুল করিম এমন অনেক ব্যক্তি শিক্ষকতা করেছেন। তাদের জ্ঞান টিকে আছে। তবে এরকম এখন কি নেই? এখনো কি কোনো শিক্ষক সার্বক্ষণিক পড়াশোনা বা গবেষণা করেন না? ল্যাবে নিরন্তর কাজ চালিয়ে যান না? আমরা অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় পণ্ডিতদের যেমন দেখেছি তেমনি অযোগ্য বা কম রেজাল্ট করা শিক্ষকতায় আসা 'চাকরিজীবী' শিক্ষকও দেখেছি। এমনটা এখনো যে নেই তা নয়। শিক্ষার পরিসর বেড়েছে বলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও এখন কম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনেক শিক্ষক। সেখানে ভালো-মন্দ উভয় ব্যাপারই আছে। এখন হয়তো কোনো শিক্ষক ফাইল নিয়ে আমলাদের পেছনে ঘোরে কিংবা কোনো শিক্ষক দুর্নীতি করে বা নিজের সুযোগ হাতিয়ে নেয় কিন্তু তার বিপরীতে তো দু-একজন মুনতাসীর মামুন অবশ্যই আছেন! এটা যদি বলি, বিশ্ববিদ্যালয় বৈশ্বিক জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং তার একটি নির্ধারিত চরিত্র আছে– সেটি কি অস্বীকার করা যাবে? কেউই কি তা অস্বীকার করবে? তবে তাকে কেন নানাভাবে 'নষ্ট' করার চেষ্টা চলছে– এটি এখন বড় জিজ্ঞাসা। আমি প্রথম শ্রেণি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আসতে চাই– সে জন্য কেন লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে? আমার শিক্ষকরা আমাকে চেনেন, আমি নির্ধারিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে প্রত্যয়ী– সেখানে কোন ধরনের খাতা-কলমে আমি পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষক হব! আমরা জানি, '৭৩-এর অধ্যাদেশের আওতায় চারটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আরও অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এবং আরও হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ আমলে, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তান আমলে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সদ্যস্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে– সবগুলোরই এই স্বাধীন দেশ জন্মের পশ্চাতে অনেক অবদান আছে। অনেকেই অবদান রেখেছেন। তাদের হাতে গড়া প্রজন্মই এখন দেশ শাসন করছে বা আইন বানাচ্ছে। কিন্তু ক্রমেই যেটি লক্ষ করা যাচ্ছে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই আর যেন বিশ্ববিদ্যালয় থাকছে না। স্বাধীনচিন্তা, মুক্ত গবেষণা, বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শনের যে প্রাচ্যভাবনা তার আন্তর্জাতীকিকরণ হচ্ছে না, হবে না– কারণ অনেককিছু আইন-কানুন, শৃঙ্খলায় এখন আটকানো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যত স্কলারশিপ তারা হাতিয়ে নিয়েছে, এখন হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ারও চেষ্টা করবে। তাদের মতে, হয়তো শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার জন্য আমলাতন্ত্রের দক্ষতাই কি বড় দক্ষতা! যিনি আমলা তিনি কি সর্ববিষয়ে পারঙ্গম! এই পারঙ্গম ব্যক্তিরা সরকারকে যা বোঝান সেটি কি সর্বসত্যে পরিণত হচ্ছে? কারণ সরকার তো বুঝি চালান তারাই। তারাই তো দেশের ভিশনারি। নইলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অক্টোপাসের জালে আটকানোর বাস্তবায়নের এজেন্ডা তারা নিয়েছেন কেন!

৩.

ব্রিটিশ আমলে যে আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ হয়েছে তা পাকিস্তান আমলে এবং পরে বাংলাদেশে নির্ধারিত বৃত্তেই থেকে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনস্বার্থে অনেক কিছুর

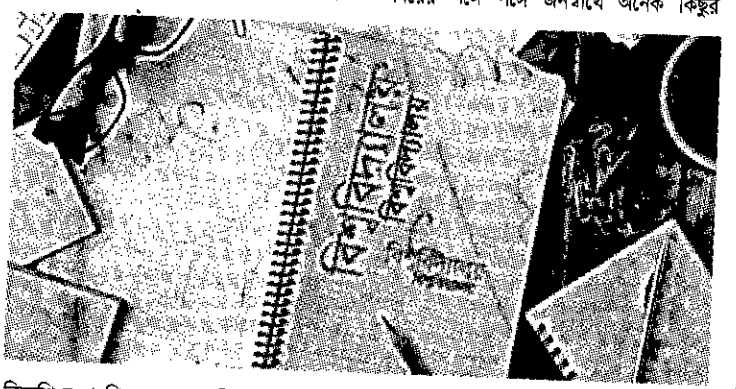

পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। আমার খুব সরল বিবেচনায় মনে হয় তা সঠিক পথে চলেনি। বরং তা পেছনমুখো হয়েছে। এটির কারণ, মুক্তিযুদ্ধের পরে দীর্ঘ সময় রাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামোয় একটি বেনিফিশিয়ারি শ্রেণি তৈরি হয়েছে। এতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে কয়েক স্তরে চেইন অব কমান্ড, যোগ্য ও চৌকস অফিসারদের মনন ও মর্যাদার প্রশ্নটি অবমূল্যায়িত হয়েছে। সাদা চোখে যা মনে হয়, সৎ ও যোগ্য অফিসার যে উদার-প্রগতিশীল ও মানবিক সত্তায় চিহ্নিত তারা তা প্রতিষ্ঠা বা সুযোগ্য উত্তরাধিকার তৈরি করতে পারেনি। ফলে এখন যা হয়েছে, অস্ত্র প্রায় ভোঁতা হয়ে গেছে। এর জন্য আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা দায়ী নয়। দায়ী আমলাতান্ত্রিক-কৃষ্টিটি তৈরি হতে না পারা। যাহোক ব্যুরোক্র্যাসি যেমন সহজ নয়, তেমনি এর পরিধিও কম নয়। তাই এর ভেতরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার সুযোগ এখানে কম। কিন্তু এখন যা দৃশ্যমান হচ্ছে তা আসলে দেশপ্রেমমূলক বা দক্ষতাসম্পন্ন যোগ্য অফিসার তেমন মিলছে না। কমেও গেছে নানা কারণে। চাকরিতে 'জব সেটিস্ফেকশন' বলে যে কথা আছে– সেটি দুর্মূল্য। তাই স্তাবক, তোষণ-পোষণ বা সুযোগসন্ধানী শ্রেণি ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়েছে। তারাই নখদন্ত বিস্তার এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়েও এক ধরনের আরোপিত অনধিকার চর্চার প্রবৃত্তি লক্ষ করা যায়। যেটি বিষয় তা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি আছে, শিক্ষকদের মধ্যে অসততা আছে বিদেশি স্কলারশিপ হয় তার ফিফটি পার্সেন্টও পান না, কমনওয়েলথ বা মনোবুসু স্কলারশিপ পাওয়ার হার ক্রমেই কমছে। এ ছাড়া বছর ধরে নানারকম যে স্কলারশিপ সেগুলো যার পাওয়ার কথা তারা পাচ্ছেন না, অপাত্রে চলে যাচ্ছে। বস্তুত দেশপ্রেমের বাইরে নিজেদের স্বার্থ-সুবিধাই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাগুলো অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে।

২.

আমি নিশ্চিত করে বলতে চাই, ওই চারটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে আইন-অর্গানোগ্রাম করা হয়েছে তা অনেকাংশেই শৃঙ্খলিত। ইতোমধ্যেই সেখানে পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়'। মৌলিক জ্ঞানের চর্চা বাদ দিয়ে প্রযুক্তি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে! তার ফল যে কী দাঁড়াচ্ছে তা তো এখন চোখের সামনেই প্রকাশ্য। অথচ মন্ত্রণালয় থেকে ইউজিসিকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন আর লিখিত পরীক্ষা নিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে তার পরিচয় কী! এই কী নীতিনির্ধারক! আর যে বিশ্ববিদ্যালয় বানানো হয়েছে– সেখানে কি শিক্ষা-দর্শনের চর্চা আছে? ব্যবসায় বাণিজ্য আর 'প্রযুক্তিবিজ্ঞানী' বানানো হচ্ছে। এখন সেই পথেই দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পাঁয়তারা করছে মন্ত্রণালয়। এতদিন বড় বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র নষ্ট করে তার হাত-পা কেটে সেটি রোধ করা কখনোই সঠিক নয়। বরং আরও অধিক সমর্থন দিয়ে তাকে উন্নত এবং জ্ঞানভিত্তিক করা যায় কিনা সে চিন্তা করতে হবে। সময় পেছনে চলে না। তাই সম্মুখের চিন্তা করা সঙ্গত। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটি ঐতিহ্য সেটি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে এবং একই সঙ্গে সামনে চলার আধুনিক রসদ জোগাতে হবে। নইলে দেশ কি এগোবে? একইভাবে অনৈতিকতা রোধেও তো ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সেটি স্বায়ত্তশাসন বা উদারিকরণ বজায় রেখেই করা সম্ভব। পাশের দেশ ভারতের জওয়াহেরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে গবেষণা হচ্ছে, পঠন-পাঠন চলছে, শিক্ষার পরিবেশ বজায় থাকছে– অথচ আমরা তা পারছি না কেন! উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মতো প্রশাসনিক আইন দিয়ে ভালো শিক্ষক যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি সততা বা উৎকৃষ্ট আদর্শকেও প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব নয়। জঙ্গি দমনে গোড়ায় হাত দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের শুধু প্রযুক্তিমুখী বা ব্যবসায় বাণিজ্যের আরোপিত জ্ঞান দিয়ে শিক্ষিত করা যাবে না। জ্ঞান পারস্পরিক ও পারস্পরিক– তুলনামূলকও বটে। দর্শন না জানলে বিজ্ঞান যেমন জানা যায় না আবার বিজ্ঞান না জানলে দর্শনও বোঝা যায় না। ইতিহাস না জানলে রাজনীতি হয় না, রাজনীতি না জানলে ইতিহাসটাও বোঝা যায় না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই জ্ঞানের পরিবেশ সৃষ্টি করলে জঙ্গি বা মৌলবাদ দমনে আলাদা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ও বাঁচবে, দেশও এগিয়ে যাবে। তাই আমরা কী করতে চাই, কোনটা বাস্তবানুগ, কোনটা সমস্যার কেন্দ্র তা অনুধাবন করতে হবে– আর বোধগম্য হলেই তার সমাধান হতে পারে– নইলে নয়।

৪.

তার পরও কাউকে প্রতিপক্ষ করা নয়, এখনকার সমাজে যে অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীনতা চলছে– তা থেকে কোনো অঙ্গনই বিচ্ছিন্ন নয়। তা সমাধানের নাম করে প্রতিষ্ঠান নষ্ট করা কোনোভাবেই সঠিক পন্থা নয়। শিক্ষকতা ব্রত সেটি মানতে হবে, শিক্ষাকে লালন ও সম্প্রসারণ করাই শিক্ষকের কাজ– সেটি আমলাতান্ত্রিক বা প্রশাসনিক বিষয় নয়। তাই মোদ্দা কথা, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বভাবে রাখুন, স্বীয় অধিকারকে অধিকতর উচ্চতায় গ্রহণ করুন– যাতে নিরবধি তা প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী হয়ে যুগোপযোগিতার কাজ করতে পারে। আধুনিক শিক্ষাকে প্রাকৃতিকভাবে গ্রহণ করতে পারে। সে লক্ষ্যে যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষা-অনুষঙ্গি পরিবেশ ও সহায়তা দেওয়া জরুরি। যে ফিল্ডে যা প্রয়োজন, যে বিষয়ে যিনি কার্যকর– তাকে কাজে লাগান। নইলে সবকিছু ভেঙে পড়বে। সমস্যার প্রকৃত সমাধানও হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় অন্ধতার আবাসন নয় আলোর অভিসারী করে তুলুন। সে জন্য প্রথম শ্রেণি পাওয়া ছাত্রের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত সিলেকশন বোর্ডের ওপরই ছেড়ে দেওয়া কী যথাযথ নয়!

লেখক : অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়